এখানে আঁধার - ২

জুরেইশ সেদিন এলো না। তার পরদিনও না। মেয়েটার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল শ্রাবন্তীর, এছাড়া ওর অনুপস্থিতিতে খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হয়নি তাকে। জুরেইশেরই বয়সী আরেকটি কিশোরী মেয়ে এসে কাজগুলো করে দিয়ে গেল। জুরেইশ অল্প ক'টা ইংরিজী শব্দ বলতে ও বুঝতে পারতো। সর্বসাকুল্যে গোটা দশেকের বেশী নয়, তবু ওইটুকু দিয়েই মোটামুটি কাজ চলে যাচ্ছিল। এ মেয়েটির ইংরিজী জ্ঞান একেবারেই শূন্য। কাজেই মেয়েটিকে কে পাঠিয়েছে, জুরেইশ আসেনি কেন, সে কোথায় এবং কেমন আছে কোন কিছুই জানা গেল না।

গোড়াতেই বোঝা উচিৎ ছিল শ্রাবন্তীর যে ওর কাছ থেকে কোন খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা বৃথা। তবু জুরেইশ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাবশত হাত নেড়ে চোখ-মুখে বিভিন্ন অভিব্যক্তি ফুটিয়ে চেষ্টায় নেমেছিল। ইথিওপিয়ার লোকেরা অঙ্গ-ভঙ্গি বা বডি-ল্যাংগুয়েজে পারদর্শী। টেলিফোনে কথা বলার সময়েও হাত নেড়ে কথা বলে, চোখে ফোনের ডায়লগ অনুসারে অতিরঞ্জিত অভিব্যক্তি ফোটায় ("ওমা, তাই নাকি? বল কি?" বলে দু'চোখ কপালে তুলে হাঁ করে থাকবে খানিকক্ষণ যদিও লাইনের অপর প্রান্তে লোকটি দু'টোর একটাও দেখতে পেলো না)।

ট্যাক্সিতে উঠেই শ্রাবন্তী একখানা বই খুলে একাগ্রচিত্তে সেই বইয়ের মধ্যে ডুবে যায়। তা না হলে ট্যাক্সি ড্রাইভার তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেবে। স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দুই হাত দিয়ে তার মুখের প্রতিটি শব্দ হাওয়ায় এঁকে দেখাবে। এবং ওদের ভদ্রতাবোধ ও অতিথিবাৎসল্য এত বেশী যে বিদেশী যাত্রীর দিকে পিঠ করে কথা বলে সুখ পাবে না। পিছন পানে চেয়ে কথা বলবে হাত নেড়ে নেড়ে। গাড়িটাকে চলমান রেখেই।

রবিবার সকালে মেনন ও তার স্ত্রী বেড়াতে এলো। আট ন'বছর ধরে এদেশে আছে ওরা। সম্রাট হাইলে সেলাসির আমল থেকে। সম্রাটের পতন ও দেশে সাম্যবাদের উত্থান - দুইয়েরই প্রত্যক্ষদর্শী ওরা। বর্তমান সরকারও টালমাটাল অবস্থায়। চারিদিকে অসংখ্য ফাটল ফুটে উঠেছে, যে কোনও সময় আগ্নেয়গিরি

ফুঁসে উঠবে। নতুন করে আবার সেই ধ্বংসলীলা দেখার সাধ নেই ওদের। তিন বছরের কন্ট্রাক্ট। দুটো কন্ট্রাক্ট পুরো করে তৃতীয় কন্ট্রাক্টের দ্বিতীয় বছর শেষ হয়েছে সবে। গোটা একটা বছর বাকী এখনও। কোন রকমে এখনই দেশে ফিরে যেতে চায় ওরা। তারই অন্ধি-সন্ধি খুঁজছে।

মেনন বললো, "অন্য ভারতীয় টিচাররাও কেটে পড়ার মতলবে আছে। তবে এরা এক কথায় ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। জোরালো কারণ দেখাতে হবে।"

শ্রাবন্তী বললো, "অনেকগুলো জোরালো কারণ খুঁজে বার করতে হবে তাহলে। আমাদের স্কুলে দুটো শিফ্‌ট মিলিয়ে আমরা আঠারো জন ভারতীয় টিচার। 'হোতে'র স্কুলে আরও আটজন। 'দেশে পিতৃদেব অসুস্থ, তাঁর সেবা-শুস্রুষা করার জন্য এই দণ্ডে আমার দেশে ফিরে যাওয়া একান্ত আবশ্যক।' এই মর্মে ছাব্বিশখানা আবেদন একযোগে আদিসের শিক্ষাদপ্তরে পৌঁছলে মন্ত্রীমশাই ভারি অবাক হবেন নিশ্চয়ই।"

মেনন হাসলো। মিসেস মেননের মুখখানাও একটু হাসি হাসি দেখালো। শ্রাবন্তীর মনে হ'ল বিপদের দিনে এরকম নিরবচ্ছিন্ন মন খারাপ করে বসে থাকার মানে হয় না। মিসেস মেনন যাতে একটু হালকা বোধ করে, এখন থেকে সে বিষয়ে সে সচেষ্ট থাকবে মনে মনে স্থির করে জুরেইশের অন্তর্ধানের খবরটা ওদের জানালো।

"আসলে আমি তো ওদের ভাষা বুঝি না। আজ তোমরা এসেছ, ব্যাপারটা জানতে পারা যাবে।"

নতুন মেয়েটা উঠোনে বসে প্রকাণ্ড কাঁধা উঁচু থালায় (এদেশে 'সাফা' বলে) কাপড় কাচছিল। এদের কাপড় কাচার ব্যাপারটা অন্য অনেক ব্যাপারের মতই ভারী অদ্ভুত লাগে শ্রাবন্তীর। 'সাফা'য় সাবানজলে কাপড় চুবোনো রয়েছে। মেয়েটি 'সাফা'র পাশে বসে দুই হাতে কাপড়ের একাংশ নিয়ে ঘষে যাচ্ছে ক্রমাগত। দেশের মত পুকুরঘাটে ভিজে কাপড় দু'হাতে ঊর্ধে তুলে আছাড় মারা, বাড়িতে কাজের লোকের কাঠের মুগুর দিয়ে দমাদ্দম কাপড় পেটানো, এসবের বিন্দুবিসর্গ নেই। দু'হাত দিয়ে নিঃশব্দে ঘষতে থাকবে খানিকটা খানিকটা করে এবং এভাবে পুরো কাপড়টা ধবধবে পরিষ্কার করে ফেলবে। ঘষা হয়ে গেলে কোথায় ধোয়াধুয়ি করে জানে না শ্রাবন্তী। ধারে কাছে কোন জলের উৎস দেখেনি। অবশ্য কাবেলের এতগুলো বাড়িতে দৈনিক প্রয়োজনে জল নিশ্চয়ই প্রচুর খরচ হয়। কাছে পিঠেই কল আছে হয়তো, শ্রাবন্তীর বাড়ি থেকে দেখা যায় না। সকাল

বিকেল জুরেইশ বালতি ভরে জল এনে রাখে। নতুন মেয়েটাও আনছে। অনেক দূর থেকে আনছে বলে মনে হয় না। হয়তো সামনের বাড়িগুলোর আড়ালেই রয়েছে কল কিংবা কুয়ো, যাই হোক না কেন।

জল সব সময় ফুটিয়ে খায় শ্রাবন্তী।

এ দেশের মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকে কত লোক যে শ্রাবন্তীকে বলেছে, "খুব সাবধান, যেখানে সেখানে জল খেও না যেন। বিপদ হবে।"

যারা বলেছে তারা কেউই বিদেশী নয়, এই দেশের অধিবাসী সব। বিদেশী আগন্তুক কেউ তাদের দেশের জল খেয়ে অসুস্থ হ'লে তাদের ব্যক্তিগতভাবে কি ক্ষতি হবে ভেবে পায় না শ্রাবন্তী। তার নিজের দেশে কোন বিদেশীকে এভাবে কেউ সতর্ক করে দেবে বলে মনে হয় না। জল কেন, বিদেশী লোকটির গন্তব্যস্থলে প্লেগ মহামারী হলেও বোধহয় তাকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার কথা মনে হবে না কারও।

নতুন মেয়েটি কাপড় কাচা সেরে ঘরে ঢুকতেই ওর হাতে কফির টিনটা তুলে দিয়ে ওর মুখের সামনে হাত তুলে চারটে আঙুল দেখালো শ্রাবন্তী। জুরেইশ থাকলে অতিথিদের জন্যে ওমলেট ভেজে দিতো। এ মেয়েটিকে রান্নাবান্না করতে বলেনি এযাবৎ। জুরেইশ নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে রোজই কোন না কোন প্রতিবেশী খাবার দিয়ে যায়। রোজদিন একই খাবার - প্রকাণ্ড বড় 'ইনজেরা' ও তার সঙ্গে ঝাল ঝাল 'ওয়াৎ'। শ্রাবন্তী দেশে থাকতে দোসা খেতে ভালবাসতো। 'ইনজেরা' দোসার চাইতেও সুস্বাদু।

নতুন মেয়েটির নাম তোয়াবেচ। মিসেস মেনন ওর সঙ্গে আমহারিক ভাষায় তর তর করে কথা বলতে লাগলো। তোয়াবেচও হাত-পা নেড়ে নানারকম ভাব-ভঙ্গিমা করে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। শ্রাবন্তী তোয়াবেচের অঙ্গভঙ্গী দেখে অনেক কিছু আন্দাজ করলো এবং রীতিমত ঘাবড়ে গেল কারণ ওদের সংলাপের তাৎপর্য বেশ ভীতিজনক। তোয়াবেচ নিজের পেটের উপর দু'হাত রেখে বিরাট ভুঁড়ির ইঙ্গিত করলো, পরক্ষণে হাতের পাতা দুটো নিজের বুক ও কাঁধের মাঝে কোনাকুনি জায়গায় চেপে ধরে যেন নবজাত বাচ্চাকে কোলে নিয়েছে এমন ভঙ্গি করলো। তারপর চোখ বুঁজে জিভের ডগা বার করে ঘাড় কাত করে নিঃস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শ্রাবন্তী চমকে উঠে অধৈর্য গলায় প্রশ্ন করলো, "কে মরে গেছে? জুরেইশ? বাচ্চাটা?"

পরক্ষণেই ওর মনে হ'ল তোয়াবেচ যে ভুঁড়ি দেখালো সেটা কার ভুঁড়ি? জুরেইশের নিশ্চয়ই নয়। মাত্র আটদিন কাজে আসেনি জুরেইশ। আটদিন আগে তো একদম চাঁছা-ছোলা ছিপছিপে ছিল সে। হঠাৎ ভুঁড়িই বা গজালো কার আর মরেই বা গেল কে?

মিসেস মেনন বললো, জুরেইশের দিদি কম্বোলচায় থাকতো। সম্প্রতি সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে ও একটি সন্তান প্রসব করে মারা যায়। জুরেইশ এখন কম্বোলচায় আছে এবং আপাতত তার ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কম। জুরেইশই যাবার আগে তোয়াবেচকে বলে শ্রাবন্তীর কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

মেননরা এদেশে এত বছর থাকার দরুন স্থানীয় রীতি-রেওয়াজ কিছু কিছু জানে। দেশের এই অঞ্চলে গরীবদের মধ্যে বিবাহসংক্রান্ত নিয়ম কানুন খুব শিথিল। এই শ্রেণীর সন্তানবতী মহিলারা অনেকেই অনূঢ়া। মেয়েদের উপর পরিবারের কড়া নিয়ন্ত্রণ। জুরেইশের দিদি হয়তো পরিবারের নির্দেশেই কম্বোলচায় থাকতো, পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার খাতিরে। জুরেইশকে হয়তো এখন তার প্রয়াত দিদির স্থান নিতে হবে।

মিসেস মেনন বললো, বাইরে থেকে এসে অন্য এক দেশের রীতিনীতির নিন্দা-সমালোচনা করা উচিত নয়। আমরা কতটুকুই বা দেখেছি। তবে এদেশের লোকেরা সাধারণত খুব সহজ সরল সৎ।

দরজায় টোকা পড়লো। ট্রে হাতে কাবেলের এক মহিলা। তোয়াবেচ মহিলার নির্দেশমত খাবারগুলো অন্য বাসনে রেখে মহিলার বাসনপত্র তাকে ফেরৎ দিয়ে গেল। দেশে কেউ খাবার দিতে এলে বাসনগুলো তক্ষুণি নিয়ে যায় না। সেই বাসনে করে প্রাপক সৌজন্যতার খাতিরে কিছু দিয়ে পাঠায়। গত ক'দিন ধরে যারা প্রতিদিন শ্রাবন্তীর জন্যে খাবার দিয়ে যাচ্ছে তারা এই কাবেলেতেই থাকে, সে এটুকুই জানে শুধু। তার চেনা পরিচিত নয় কেউই। জনে জনে প্রতিদান দেওয়া তার পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু খাবার ঢেলে নিয়ে না-ধোওয়া বাসন ফেরৎ দিতে ভারী খারাপ লাগে তার। অথচ ওরা এসে ওর কাজের মেয়েকে সেই রকমই নির্দেশ দেয়।

মিসেস মেনন বললো, "এ নিয়ে তুমি একটুও ভেবো না। তোমার প্রতিবেশীদের একমাত্র চিন্তা কি করে তোমায় সাহায্য করবে। ওরা কোনও প্রতিদান চায় না। তোমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হোক ওরা তা চায় না। বাসন ধোয়াধুয়ি করলে ওদের মনে হবে অনর্থক ওই কষ্টটুকু পোয়াতে হল তোমায়। ঘরে বাসন ধোয়ার ব্যবস্থা থাকলেও কথা ছিল। মেয়েটাকে বাইরে গিয়ে ধুয়ে আনতে হবে তোমার সংসারের অন্য কাজ ফেলে। এরা সেটা চায় না।"

তোয়াবেচ পাশের ঘর থেকে শ্রাবন্তীকে ডাকলো। ইশারায় প্লেটের খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে তারপর একটু আড়ালে সরে গিয়ে আঙুল দিয়ে অতিথিদের দেখালো। শ্রাবন্তী দেখলো থালায় খাবারের স্তূপ। রোজ দু'খানা ইনজেরা থাকে। আজ চারখানা ইনজেরা আর সেই পরিমানে অনেকখানি 'ওয়াৎ'। বাটিতে কুলোয়নি বলে তোয়াবেচ ছোট ডেকচিতে রেখেছে 'ওয়াৎ'। অর্থাৎ শ্রাবন্তীর অতিথিদের আগমন বার্তা জানতে পেরে বেশী করে খাবার দিয়ে গেছে আজ। এদেশে এসে অবধি বারবার এত অপ্রত্যাশিতভাবে ভাল ব্যবহার পেয়েছে শ্রাবন্তী যে সেটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে বাধে না আর। তবু নতুন করে মনটা তার কানায় কানায় ভরে গেল।

মেননরা বেলাবেলি চলে গেল, রোদ থাকতে থাকতে। অনেকখানি পথ হেঁটে যাবে ওরা। তবে ওদের পাড়াটা আর একটু জনবহুল এলাকায়। কুতবাবেতের মত আধুনিক না হলেও খাঁটি বনেদি পাড়া। কাবেলে ও তার একটু দূরে কুতবাবেত -- দুটোই শহরের বাইরে খোলামেলা জায়গায়। কাবেলে গ্রাম। কয়েক সারি মাটির বাড়ি শুধু। পিছনে পাহাড়। মনে হয় দু'কদম হাঁটলেই পৌঁছনো যায়। প্রতি রাতে পাহাড়ের ঢল বেয়ে হায়েনার দল শ্রাবন্তীর বাড়ির পাশ দিয়ে নদীতে যায়। ই-ক্কু, ই-ক্কু করে অদ্ভুত একটা ডাক ছাড়ে সব ক'টা হায়েনা মিলে। আওয়াজটা ওদের গতির সঙ্গে এগিয়ে যায়। রাতের প্রথম প্রহরে পাহাড় থেকে নদীর দিকে, আবার ভোর রাত্রে ফিরতি পথে, নদী থেকে পাহাড়ের দিকে। দারুণ ভীতিজনক মনে হয় চলমান ওই যৌথ আওয়াজ। আবার জানলার বাইরে কোন কোন দিন হায়েনার হাসিও শুনেছে শ্রাবন্তী। যেন গ্রামের পথে প্রগল্‌ভ মেয়েগুলো হেসে গড়িয়ে পড়ছে সখীদের রসিকতা শুনে।

আজকাল মাঝে মাঝে বেশ ভয় করে শ্রাবন্তীর। এটা আগে ছিল না। আগে শশাঙ্কর চিঠি আসতে এত দেরী হত না। চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা দিয়েই দিনের

অনেকখানি সময় কেটে যেতো। চিঠির কথাগুলো মনের মধ্যে আনাগোনা করতো, শ্রাবন্তীর মনটাকে মধুর আমেজে ভরিয়ে রাখতো দিনভোর।

সেদিন মেননদের সঙ্গে কথা বলার পর আরও মুষড়ে পড়েছে শ্রাবন্তী। এত কথা জানতো না সে। সেদিন অনেক নতুন কথা শুনলো। সাম্যবাদের অভ্যুত্থানের ইতিহাস হিংস্রতায় ভরা। এদেশের মানুষের যে গুণগুলো দেখে এতকাল মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিল শ্রাবন্তী, সেটা তাদের চরিত্রের একটা দিক শুধু। হিংস্রতা-হানাহানিতে সংহারলীলায় এরা পিছপা হয় না। পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল মানুষের ব্যবহার। সব দেশের মত এদেশেও।

কুতবাবেতের ভারতীয় শিক্ষকদের মাথায় বাজ পড়লো একদিন। গৃহদপ্তর থেকে লোক এসে তাদের জিনিসপত্তর, বাক্স-প্যাঁটরা বাইরে বার করে দরজায় তালা এঁটে দেয়ালে কাগজ চিপকে দিয়ে চলে গেল। কি ব্যাপার, না এদের নাকি সারা বছরের বাড়িভাড়া বাকি। সব ক'জন ভারতীয় শিক্ষকেরই। ওমা, সে কি? প্রতি মাসেই তো নিয়ম মাফিক ভাড়ার টাকা প্রতিবেশী সহকর্মী আসনাকের হাতে পাঠিয়ে এসেছে বরাবর।

বাড়ি-ভাড়াটা নিজে গিয়ে দিয়ে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হলেও ভাষা বিভ্রাট ও অব্যবস্থার দরুন ভারি ঝক্কি-ঝামেলার ব্যাপার সেটা। প্রায়দিনই কেরানী দপ্তরে আসে না, এলেও কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। প্রায়ই অফিস বদল করে কর্মীরা, আজ এখানে কাল সেখানে ডিউটি পড়ে। দপ্তরে পৌঁছে আসল লোকটিকে শনাক্ত করতে জীভ বেরিয়ে যায়। তাই আসনাকে যখন নিজে থেকে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসে বললো গৃহ দপ্তরে আসনাকের চেনা লোক আছে, আসনাকে অনায়াসে তাদের সক্কলের বাড়ি ভাড়া দিয়ে আসতে পারে, তার পক্ষে মোটেও কোন অসুবিধা নেই, কুতবাবেতের ভারতীয় শিক্ষকরা প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে করতে এই দুরূহ কাজটি তার হাতে তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হল।

এখন বোঝা গেল আসনাকে গত এক বছর ধরে তাদের ভাঁওতা দিয়ে এসেছে। কারও বাড়ি ভাড়াই যথাস্থানে জমা করেনি। একটিবারও না। আমহারিকে লেখা এক চিলতে করে কাগজ যা তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে বাড়ি ভাড়ার রসিদ বলে সেগুলো রসিদই নয় মোটে, অবান্তর হিজিবিজি। আসনাকে এদের ধরাছোঁয়ার বাইরে এখন। তল্পি-তল্পা গুটিয়ে পগাড় পার হয়ে গেছে।

বিপক্ষী দলের সঙ্গে ভিড়েছে আরও অনেকের মত।

রমেশ শর্মা আক্ষেপ করে বললো, "ওর নাম দেখেই বোঝা উচিত ছিল। আসনাকের ইংরিজী বানান A snake। লোকটা দুমুখো সাপ।"

মিসেস মেননকে দোভাষী করে তোয়াবেচের প্রতিদিনের কাজ তাকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে একটা লিস্ট বানিয়ে দিলো শ্রাবন্তী। তোয়াবেচ বলেছে সে ওমলেট ভাজতে জানে। ভাত রাঁধা শিখিয়ে দিলে রোজ শ্রাবন্তীর জন্যে রান্না করে দেবে। শ্রাবন্তী বললো ও যে রান্না জানে এবং এখন থেকে ও-ই শ্রাবন্তীর রান্না করবে এ কথা প্রতিবেশীদের জানিয়ে দিতে। তাহলে আর রোজ দিন বাড়ি বয়ে ইনজেরা - ওয়াৎ দিয়ে যাবে না তারা।

তোয়াবেচকে সকাল সকাল ছেড়ে দেয় শ্রাবন্তী। প্রয়োজনীয় কাজগুলো তড়িঘড়ি করে নেয় তোয়াবেচ। ভাতটা নিজেই রেঁধে নেয় শ্রাবন্তী। ইদানীং প্রায় দিনই খিচুড়ি রাঁধে - চাল ডাল ও অল্প একটু সবজি কেটে এক সঙ্গে চড়িয়ে দেয়। জুরেইশের সঙ্গে একটা স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। করণীয় কাজগুলো করে মুখে হাসি নিয়ে শ্রাবন্তীর আশেপাশে ঘোরাফেরা করতো জুরেইশ। আরও অন্য কাজ খুঁজে বার করতো। স্বল্প-জানা ইংরিজীর শব্দগুলো ঝালাতো, শ্রাবন্তীর সঙ্গে মাঝে মাঝে বার্তালাপ করতো কাজের বাইরেও। জুরেইশের কথা ভেবেই আরও তোয়াবেচকে দূরে দূরে রাখে শ্রাবন্তী। কি হবে মায়া বাড়িয়ে!

মঙ্গলবার থেকে গলাটা ব্যথা ব্যথা করছিল। সেদিন স্কুলে গিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে এলো। একটা ক্লাশও নিলো। বুধ, বিষ্যুৎ, শুক্কুর তিন দিন স্কুলে যেতে হবে না তাকে। তারপর শনি, রবি ছুটি। এখানে ছুটি দিতে কোন কার্পণ্য নেই স্কুলে। প্রয়োজন হলে সোমবার স্কুল করে আবার তিন দিন ছুটির দরখাস্ত দিয়ে আসতে পারা যায়। তবে একসঙ্গে তিনদিনের বেশী ছুটি নেবার নিয়ম নেই। চতুর্থ দিন একবার মুখ দেখিয়ে আসতে হয়। শ্রাবন্তীর সহকর্মী কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষক এভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। এরা দেশে ফিরে যেতে চায় কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের ছাড়বে না। এসে যখন পড়েছে আর ছাড়াছাড়ি নেই। পড়াও না পড়াও স্কুল রেজিস্টারে নামটা থাকলেই হ'ল। মাইনে কাটারও কোন রেওয়াজ নেই।

ভোরবেলা সামনের দরজায় ঠক-ঠক আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল শ্রাবন্তীর। এ সময় সামনের দরজায় ডাকে কে? ঘুম-চোখে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে থেকেও তালা বন্ধ দরজাতে, ইচ্ছে করলেও ভিতর থেকে খুলতে পারবে না এখন। পিছনের দরজা, যেটা বারোয়ারী উঠোনের দিকে খোলে সেই দরজা দিয়েই সচরাচর যাতায়াত করে শ্রাবন্তী। শ্রাবন্তী দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে অদেখা আগন্তুককে উদ্দেশ্য করে ইংরিজীতে বললো পিছন দিকের দরজার দিকে আসতে। কাউকে দেখা গেল না। ঘণ্টা খানেক পর তোয়াবেচ এলো।

শ্রাবন্তী ব্যস্ত হয়ে শুধোলো, "কি হয়েছে?"

পর মুহূর্তে মনে হল ওকে প্রশ্ন করা বৃথা। কিন্তু কিছু যে একটা ঘটেছে তা তোয়াবেচকে দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছে শ্রাবন্তী। কেমন নিস্প্রাণ কাঠ-কাঠ অন্যমনস্ক হাবভাব। দুম দাম করে হাত থেকে জিনিস পড়ছে। বারে বারে ধাক্কা খাচ্ছে দেয়ালে - দরজায় - খাটের মাথায় আর আতঙ্কিত চোখে চারিদিকে কি যেন খুঁজছে।

শ্রাবন্তীর মন মেজাজ দারুণভাবে খিঁচড়ে গেল তোয়াবেচের রকম-সকম দেখে। জুরেইশের অভাব নতুন করে অনুভব করলো সে। জুরেইশ থাকলে শ্রাবন্তী জানতো একটা অন্তত আপনজন আছে এখানে, একজনের উপর ভরসা করতে পারে সে। এ যেন এক সম্পূর্ণ অজানা জগতে পথ ভুলে ঢুকে পড়ে বেরুবার পথ হারিয়ে ফেলেছে। অল্প কয়েক সপ্তাহে কি দারুণ পরিবর্তন! কাবেলের বাসিন্দাদের মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেছে। শ্রাবন্তী বেশ বুঝতে পারে ওর চোখ এড়িয়ে বেড়ায় সবাই, মুখোমুখি হ'লে তৎক্ষণাৎ উল্টো দিকে পা চালিয়ে সরে যায় চটপট। আগে হলে এ বিষয়ে শশাঙ্কর মতামত জানতে চাইতো, জেনে নিতো কি তার করণীয়। কিন্তু চিঠির সূত্র আগের মত মজবুত নেই আর। বহুদিন পর একখানা হয়তো চিঠি হাতে আসে, পথভুলে এসে গেছে কোনমতে। হয়তো এক মাস আগের তারিখ দেওয়া। কোন চিঠিটার উত্তরে লেখা চিঠিখানা, খেই হারিয়ে ফেলে শ্রাবন্তী।

বাঁদিকের বাড়ির বুড়িটা প্রায়ই চোরা-চাউনি দিয়ে দেখে শ্রাবন্তীকে। বুড়ির কাছে কারা সব আসে, গাবিতে মুখ ঢেকে। তবু আকার আয়তন অঙ্গভঙ্গী দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারে শ্রাবন্তী মাত্র দু'তিনজন একই লোকেরা যে বারে বারে আসছে তা নয়। অনেকজন আসে। বুড়ির বাড়িটা একটা আড্ডা গোছের,

কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত হয় ওরা। তা না হয় হ'ল, কিন্তু শ্রাবন্তীর প্রতি ওদের নজর কেন? কি চায় ওরা? ওরা যে শ্রাবন্তীর উপর নজর রাখছে, ঠারে ঠোরে বারবার ওর বাড়ির কাছে আসে, দরজায় দাঁড়ায়, ফিসফিস করে ওর কথা বলাবলি করে, শ্রাবন্তী হলফ করে বলতে পারে। কিন্তু কেন?

গত দু'মাস ধরে ক্রমাগত ছুটি নিচ্ছে শ্রাবন্তী। সোমবার স্কুলে গিয়ে মঙ্গল-বুধ-বিষ্যুৎ, এই তিনদিনের ছুটির দরখাস্ত দিয়ে আসে। শুক্কুরবার "শিব সভা", পার্টির মিটিং বসে স্কুলে, তাই হাফ-ডে। তারপর আবার সোমবারে স্কুলে গিয়ে তিন দিনের দরখাস্ত দিয়ে আসে।

দেশ থেকে চিঠি আসা কমে গিয়ে এই একটা সুবিধা হয়েছে, নির্মম চিত্তে নিজেকে মনে করিয়ে দেয় শ্রাবন্তী। আগে হ'লে ওর এই অস্বাভাবিক আচরণের, স্কুলের কাজে এই লজ্জাকর গাফিলতির কি জবাবদিহি দিতো শশাঙ্কর কাছে? হয়তো তা হ'লে এর প্রয়োজন হ'ত না। এতকাল হয়নি। হঠাৎ সবকিছু কেমন আলগা হয়ে আসছে শ্রাবন্তীর চারিদিকে।

স্কুলের টিচারদের আচরণও বদলে গেছে। সবাই সবাইকে এড়িয়ে চলে। যেন অদৃশ্য কোন শত্রুর ভয়ে সাবধানতার বর্মে নিজেকে মুড়ে নিয়েছে সবাই। এদেরই মধ্যে শত্রু লুকিয়ে রয়েছে। সে যে কেউ হ'তে পারে, যখন খুশি হানতে পারে মৃত্যুবাণ। ভারতীয় টিচাররাও নিজেদের মধ্যে মেলামেশা কমিয়ে দিয়েছে। অন্তত স্কুলে জোট বেধে থাকে না আর। ন্যাশনাল বার'এ যাতায়াত বন্ধই হয়ে গেছে প্রায়। স্টাফরুমে সেই স্ত্রীলোকটি চা বানায় এখনো। তবে বসার জায়গাটায় একটু পরিবর্তন হয়েছে। এখন সে দেয়ালের গায়ে স্টোভ রেখে পিছন ফিরে বসে চা বানায়। গ্রাহক চা নিতে গেলে মুখখানা একটু এদিকপানে করে চায়ের বেচাকেনা সেরে আবার পিছন ফিরে বসে। ট্রে-তে করে চা দিয়ে যায় না জনে জনে।

রাত দু'টো নাগাদ পিছনের দরজায় জোরে টোকা দিল কেউ। ঠক - ঠক - ঠক। ঠিক তিনবার। শ্রাবন্তী জেগে ছিল। কান খাড়া করে রইলো। না, আর শোনা গেল না আওয়াজটা। সারা রাত ঘুম এলো না শ্রাবন্তীর। ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলো এই বুঝি আবার টোকা দেওয়ার আওয়াজ শুনবে। এই গভীর রাতে কে টোকা দিতে পারে? জানলার বাইরে হায়েনার হাসি শুনেছে শ্রাবন্তী। হয়েনারা

দরজায় টোকা দেয় এ কথা শোনেনি কোথাও।

রাত শেষ হতে বোধহয় দেরী নেই আর। কিন্তু হায়েনাগুলো এখনো ফিরলো না তো! রাতের প্রথম প্রহরে ওদের পাহাড় থেকে নামার আওয়াজও শোনেনি শ্রাবন্তী। ওরা কি নামেনি? নাকি শ্রাবন্তীই খেয়াল করেনি? কটা বাজলো কে জানে। ভোরের আলো ফুটতে বড় দেরী হচ্ছে আজ।

হঠাৎ আবার একটা আওয়াজ শুনলো শ্রাবন্তী। এবারকার আওয়াজটা অন্য রকম। দরজায় ঠক ঠক করে করাঘাত নয়। মেঝের উপর দুম-দুম করে চলার শব্দ। পাশের ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে কেউ। সন্তর্পণে লুকিয়ে নয়, দুম-দুম করে পা ঠুকে ঠুকে জানান দিয়ে। সামনের দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে পড়েছে, তাই আর দরজা ঠোকার শব্দ শোনেনি শ্রাবন্তী। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল।

দুম-দুম আওয়াজটা থেমে গেল। নিঃশ্বাস নিতেও ভয় করছে শ্রাবন্তীর, যদি নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে জেনে ফেলে শ্রাবন্তী এ ঘরে আছে! সুইচ টিপে ঘরের বাতি জ্বাললো কেউ। এ কি? আজ তো শনিবার! সারা রাত বিজলী বন্ধ থাকার কথা!

ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করে নিলো শ্রাবন্তী।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বুড়ি বললো, "চটপট উঠে পড়। তোমায় এখন চান করাবো, সাজাবো। পুজোর আর দেরী নেই। সিনীবালীর সন্ধিকাল প্রত্যেক বার আসে না।"

শ্রাবন্তীর গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছিল না। আপ্রাণ চেষ্টায় সাহসের ভান করে বললো, "আমায় বিরক্ত করো না। এভাবে ঘরে ঢুকে কাঁচা ঘুম ভাঙাতে কে বলেছে? তুমি যাও, আমি ঘুমোবো।"

বুড়ি রুক্ষ হাতে শ্রাবন্তীর গালে ঠোনা মেরে বললো, "লক্ষী মেয়ে, উঠে পড়ো। কেউ আমার অবাধ্য হয় না। তুমিও হবে না। শেষ রাতের পুজোটা হয়ে গেলেই তো ঘুমিয়ে পড়বে তুমি। কেউ তোমার ঘুম ভাঙ্গাবে না আর।"

বুড়ির পিছনে গাবি ঢাকা লোক দুটো এগিয়ে এলো। একটা লোক শ্রাবন্তীকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলো, শ্রাবন্তী যেন ছোট্ট একটা মেয়ে। অন্য লোকটা শ্রাবন্তীর মাথার উপর কালো একটা টুপি পরিয়ে গলা অবধি টেনে দিলো সেটা। হাত দুটো বেঁধে দিলো পিছমোড়া করে। খানিকবাদে কোথায় নিয়ে এলো তাকে

দেখতে পেলো না শ্রাবন্তী, কিন্তু ধূপ-ধূনোর গন্ধে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে স্পষ্ট চিনতে পারলো এটা তাদের গ্রামের সেই পুরোনো কালীমন্দির।

ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের পুজোটা ওরা গ্রামেই কাটিয়েছিল। ঝাড়া দেড়-দু'মাস ছিল সেবার। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো কাটিয়ে বাড়ি ফিরলো। দুর্গাপুজোয় অনেক আনন্দ করেছিল ওরা, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনেরা মিলে। তবে কালীপুজোটা একেবারেই অন্যরকম। চারটে ছাগল বলি দেওয়া হ'ল। আগে থেকে মানৎ করা ছিল নাকি। বলির সময় শ্রাবন্তী থাকতে চায়নি। আগেভাগে উঠে চলে আসছিল। কিন্তু ভাইবোনেরা চেপে ধরলো। এমন কি জ্যেঠিমা, ছোটকাকা - ওরাও বললো বলি দেখলে পুণ্যি হবে। ভাল ঘর-বর একেবারে হাতের মুঠোয় এসে যাবে। এমন কি ভাল রেজাল্টও। মা দ্বিধাভরা চোখে শ্রাবন্তীকে দেখলেন, মুখে কিছু বললেন না। শ্রাবন্তী হলফ করে বলতে পারে মা নিজেও ওই রক্তাক্ত ব্যাপার দেখতে চাননি। সবার সামনে এড়াতে পারলেন না। প্রথম বলিটা দেখেই ছুটে পালিয়ে এসেছিল শ্রাবন্তী। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বমি, জ্বর ----। জ্বরের ঘোরে ভুল বকা ----।

পুজোর জায়গাটা একটু অন্য রকম লাগলো আজ যদিও শ্রাবন্তী স্থির নিশ্চিত এটা ওদের গ্রামের কালীমন্দির। ওই তো এক পাশে গলাকাটা ছাগলটা রয়েছে যেটাকে বলি দিতে দেখে শ্রাবন্তীর চেতনায় অমন মর্মান্তিক আঘাত লেগেছিল। আজ আর গোটা ছাগলটা নেই, শুধু কাটা মুণ্ডুটা বেদির হাতখানেক দূরে পূজা সামগ্রীর মধ্যে রাখা। রকমারি জিনিস সাজানো রয়েছে পুজোমণ্ডপে। তবে ধারে কাছে আর একটাও ছাগল নেই। কাটা মুণ্ডুটা শ্রাবন্তীর মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

শ্রাবন্তীর ভারী অস্বস্তি হচ্ছিল মুণ্ডুটাকে দেখে। সে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চোখ ফেরালো আর তখনি দেখলো মণ্ডপের আধো-অন্ধকার অংশটায় মাটিতে কারা যেন বসে আছে। মেনন, মিসেস মেনন, তাদের আট বছরের মেয়ে কৌশল্যা, শ্রাবন্তীদের স্কুলের ডিরেক্টর অতো মেসফিন ও আরও কয়েকজন। অতো আব্রাহামকেও দেখতে পেলো। তবে সে অন্যদের সঙ্গে মাটিতে বসে নেই, বড় একটা কাঁসার থালা হাতে মাটিতে বসা লোকেদের কপালে চন্দনের তিলক এঁকে গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে। শ্রাবন্তীকে দেখতে পেয়ে হেসে মাথা নাড়লো।

তারপর কাছে এসে ফিসফিস করে বললো, "আরও জনা আষ্টেককে আনতে

লোক গেছে। ঘণ্টাদুয়েক লাগবে সবক'টা বলি দিতে। তবে আপনার চিন্তা নেই। আমি কিউ জাম্প করিয়ে আপনাকে আগে পাঠিয়ে দেবো। হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে না।"

থালার মালাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে একটা পছন্দসই মালা নিয়ে শ্রাবন্তীর গলায় পরাতে এগিয়ে এলো। শ্রাবন্তী চট করে এক পাশে সরে এলো। অতো আব্রাহাম অধৈর্য মুখে আবার এগিয়ে আসতেই শ্রাবন্তী জোরে ধাক্কা মারলো। অতো আব্রাহাম চিৎকার করে আমহারিক ভাষায় কি সব বলতে লাগলো। বুড়ি পুজো ফেলে উঠে দাঁড়ালো। তারপর একপাশে রাখা চকচকে খাঁড়াখানা হাতে নিয়ে খাঁড়া উচিয়ে শ্রাবন্তীর দিকে ধেয়ে এলো। ঘরের অন্ধকার কোণে অপেক্ষারত হবু বলিদের ডাকার কত চেষ্টা করলো শ্রাবন্তী কিন্তু তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। মিঃ মেনন তার সঙ্গীদের নিয়ে চুপচাপ মাটির দিকে চেয়ে বসে রইলো।

পুজোর জায়গাটা বেশ প্রশস্ত হলেও তেমন কিছু বড় নয়। পুজোর আসন থেকে উঠে খাঁড়া হাতে শ্রাবন্তীর উপর হামলা করতে বুড়ির বেশী সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু বুড়ি তার দিকে সিধে আসার বদলে ঘরময় রণনৃত্য করতে লাগলো। ওঃ সে কি উদ্দাম নাচ! দুমদাম আওয়াজ হতে লাগলো ক্রমাগত। শ্রাবন্তীর চোখে আঁধার নেমে এলো। সেই উত্তাল নাচের দুম দাম আওয়াজ ছাড়া তার চেতনা থেকে সবকিছু মুছে গেল ----।

দুম্ দুম্ দুম্ ---- মিসাস! মিসাস! ওপেন দ্য ডোর ----।

শ্রাবন্তী চমকে চোখ খুলে দেখে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে। জানলার বাইরে প্রথম ভোরের নরম আলো। দরজায় অবিরত করাঘাত। সেই সঙ্গে সমবেত ডাক - মিসাস! মিসাস! ওপেন দ্য ডোর। শ্রাবন্তী ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিলো।

তোয়াবেচ ও ডেসির এডুকেশন অফিসার অতো দাওয়িৎ। এ ছাড়া দু'জন ইথিওপিয়ান প্রতিবেশী - এই "কাবেলে"র কর্তাব্যক্তিরা সম্ভবত। এদের পিছনে ভারতীয় যে ভদ্রলোক স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন তাকে দেখে শ্রাবন্তী অবাক হ'ল এবং এই মুহূর্তে খুশিও হ'ল।

শ্রাবন্তীকে দরজা খুলতে দেখে মুখের হাসি আরও প্রশস্ত করে সমরেশ মজুমদার বললেন, "আসতে পারি?"

প্রতিবেশী দু'জন মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে অতো দাওয়িতের অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলো।

অতো দাওয়িৎ ঘরে ঢুকে বললেন, "মিসেস চ্যাটার্জি আপনি আজকে একবার আমার অফিসে আসবেন। এই ধরুন দশটা নাগাদ? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।"

অতো দাওয়িৎ বিদায় হ'লে শ্রাবন্তী সমরেশ মজুমদারকে বসতে বলে চট্ করে চোখে মুখে জল দিয়ে এলো। ডেসির ইদানীংকার আবহাওয়া শ্রাবন্তীর উদ্বেগ দারুণ ভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল। সমরেশ মজুমদারকে দেখে ও যেন হাতে আকাশ পেলো। শ্রাবন্তীর মনে পড়লো ভদ্রলোক বলেছিলেন ওঁর স্ত্রী শ্রাবন্তীর জন্য চিন্তিত, ডেসির বাঙ্গালীরা একে অপরের জন্যে করে টরে খুব। সেদিন এসব কথা শ্রাবন্তীর মোটেও ভাল লাগেনি, বিশেষ করে এক সম্পূর্ণ অচেনা মহিলার হাতে দুম্ করে একটা চালের প্যাকেট ধরিয়ে দেওয়া কৃষ্টিহীনতার পরাকাষ্ঠা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ সমরেশ মজুমদারের গোলগাল হাসি হাসি মুখখানা দেখে একটা স্পষ্ট নিশ্চিন্ততার রেশ অনুভব করলো সে।

হাউসকোট ছেড়ে ভদ্র বেশবাসে তৈরী হয়ে পাশের চেয়ারটা সামনে টেনে নিয়ে বসলো শ্রাবন্তী।

স্বাভাবিক গলায় বললো, "বলুন এবার।"

ওর বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। দারুণ একটা আতঙ্ক আর নিরাশার জগতে আবদ্ধ হয়ে আছে শ্রাবন্তী, তার প্রিয় পরিচিত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে উঠে সমরেশ মজুমদারকে দেখে ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল, "যাক আর ভয় নেই। নিশ্চয় মুক্তির বারতা এনেছেন ভদ্রলোক।"

পাছে তার প্রত্যাশা ভেঙ্গে যায়, তাই তড়িঘড়ি তাঁর এই আচম্বিতে আগমনের কারণ শুধোতে যায়নি, সময় নিয়েছে। এই অলীক নিশ্চিন্ততার নশ্বর মুহূর্তগুলো দীর্ঘায়ত করতে চেয়েছে যতদূর সম্ভব।

সমরেশ মজুমদার ব্রিফকেস খুলে চওড়া একটা খাম বার করতে করতে বললেন, "আর চিন্তা নেই মিসেস চ্যাটার্জি। আপনার স্বামী সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আগামী সপ্তাহে দেশে ফিরে যাবেন আপনি।"

শ্রাবন্তীর মনে হ'ল স্বপ্ন দেখছে।

"এ স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে দিও না ঠাকুর।" মনে মনে ঈশ্বরকে মিনতি করে সে।

খামটা ওর হাতে দিয়ে সমরেশ মজুমদার বলে চললেন, "করিৎকর্মা লোক

আপনার স্বামী। দিল্লী গিয়ে ফরেন অফিসে আপনার দেশে ফেরার ব্যবস্থায় সাহায্য চান। আদিসে ভারতীয় দূতাবাস থেকে শিক্ষা মন্ত্রকে চিঠি যায়। ওরা আপনাকে কনট্রাক্ট থেকে মুক্ত করেছে। এমন কি কোনও ভরতুকি চায় না ওরা যদিও আপনার স্বামী আপনার মাঝপথে কন্ট্রাক্ট ভাঙার জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি ছিলেন।"

"কিন্তু আপনি এ সবের মধ্যে এলেন কি করে?" শ্রাবন্তী কাগজপত্রগুলোয় চোখ বুলিয়ে সযত্নে খামে ভরে বললো।

"আরে, গত দশ দিন ধরে ওর সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ আছে আমার! এর মধ্যে বার পাঁচেক ফোন করেছেন। আমি যথাসাধ্য ইনফরমেশন জানিয়েছি, এখানকার আবহাওয়া, কার্যবিধি ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যক্রমে আদিস আর ডেসির মধ্যে যাতায়াত, খবরের আদান প্রদান সব কিছু বন্ধ, তা না হ'লে এ সব কথা আপনাকে আগেই জানাতাম। দেড় মাস পরে ডেসিতে এসেছি তাও মিলিটারী ট্রাকে করে। আমাদের অফিসের কাজকর্ম আপাতত বন্ধ। আগামী ক'সপ্তাহে কি যে হ'তে চলেছে খোদায় মালুম। এর মধ্যে কোথায় ডেভেলপ্‌মেন্ট আর কোথায় কি।"

শ্রাবন্তী সভয়ে বললো, "আপনি আজই চলে যাবেন নাকি?"

সমরেশ মজুমদার দরাজ গলায় হেসে বললেন, "ঘাবড়াবেন না মিসেস চ্যাটার্জি। মিঃ চ্যাটার্জি সব ছক বেঁধে দিয়েছেন। পরশু দুপুরে আর্মি কনভয়ের সঙ্গে আমার অফিসের বাদবাকী বিদেশী কর্মী আদিসে যাচ্ছে। আপনি ও যাবেন আমাদের সঙ্গে। ওই কাগজগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন আজ। রিলিজ অর্ডার, এটা সেটা। ভারতীয় রাজদূতের অনুরোধে এরা স্পেশাল ছাড় দিয়েছে আপনাকে। নইলে এদেশ থেকে বেরোনো সহজ নয়। অক্টোপাসের মত চারপাশে বেঁধে ফেলে। অন্তত তিরিশ জায়গা থেকে নো অবজেক্‌শন সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে, প্রতিটি অ্যাপ্‌লিকেশন ইন ডুপ্লিকেট, সঙ্গে চার জোড়া করে ছবি।"

"ও মাগো। আমার তো একটাও ফটো নেই।"

"আপনার কিচ্ছু লাগবে না। ইউ আর ভেরী লাকি মিসেস চ্যাটার্জি। অমন একখানা স্বামী পেয়েছেন। হ্যাট্‌স্ অফ টু হিম। সমস্ত দিক বিবেচনা করে একেবারে কাষ্ট আয়রন ফুলপ্রুফ ব্যবস্থা করে পাঠিয়েছেন ----।"

শ্রাবন্তীর দু'চোখ জলে ভরে যায়। কতদিন শশাঙ্কর সঙ্গে সামান্যতম যোগাযোগটুকুও নেই তার!

সমরেশ মজুমদার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"আমি উঠি এবার। হিরাট হোটেলে রুম নং আঠারোয় আছি। কিছু দরকার হ'লে খবর পাঠাবেন। পরশু দুপুর একটায় আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাবো। আমাদের অফিসের ভ্যানে।"

সমরেশ মজুমদার যাবার পর শ্রাবন্তী শোবার ঘরে এসে প্যাকেট থেকে কাগজপত্রগুলো বার করলো। একটা মুখ আঁটা খাম খুলে চিঠিটা বার করে সামনে মেলে ধরলো। শশাঙ্কর চিঠি। এদেশে দুর্যোগ শুরু হবার পর শশাঙ্কর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না শ্রাবন্তীর। আজ কতদিন পর শশাঙ্কর চিঠিখানা পৌঁছলো তার কাছে! দূতাবাসের ঠিকানায় পাঠিয়েছে, ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে।

সত্যিই শ্রাবন্তী ভাগ্যবতী। দারুণ ভাগ্যবতী।